লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

পুত্র সন্তানের প্রাধান্য, আধুনিক প্রযুক্তি ও মূল্যবোধ ঃ প্রসঙ্গ-বাংলাদেশ

ডঃ শেখ আবদুস সালাম *
আবু জাফর মোঃ শফিউল আলম * *

১.০ ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে এর জনসংখ্যা প্রায় ১২কোটি। জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান নবম ও এশিয়ায় পঞ্চম। জনসংখ্যাবিদদের প্রক্ষেপণ অনুসারে আগামী ৩৪ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে।[১] তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা, তবে সরকারিভাবে বহুমুখী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু হওয়ায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩.১ ভাগ, বর্তমানে তা কমে ১.৮-এ দাঁড়িয়েছে।

১.২ ১৯৭৫ সালে এ দেশে দম্পতিদের সন্তান কামনার হার ছিল ৪,১ ভাগ; ১৯৮৯ সালে এ হার ছিল ২.৯ এবং বর্তমানে তা আরও কম। বাংলাদেশের জনসংখ্যার উদ্বেগজনক দিক হচ্ছে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৪৩ ভাগ নির্ভরশীল অর্থাৎ এদের বয়স ১৫ বছরের নীচে এবং ৬০এর উপরে। এ দেশে প্রজননক্ষম মহিলার হার মোট মহিলার ৪১ ভাগ। এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৮ জন নিয়মিত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতা, বাকী ৫২ ভাগ সক্ষম দম্পতিও কোন না কোন জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত, এটি অবশ্য একটি আশাব্যঞ্জক দিক।[২]

১.৩ বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৩ সালে এবং তা ছিল বেসরকারি উদ্যোগে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৭৬ সালে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির জন্য একটি নীতিমালা প্রণীত হয়। বর্তমানে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচির জন্য একটি নীতিমালা

* সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
* * ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট

প্রণীত হয়। বর্তমানে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এখন একটি আন্দোলন হিসেবে পরিচালিত।

২.০ জনমিতিক স্তর ও বাংলাদেশের অবস্থান

২.১ E. M. Rogers[৩] জনসংখ্যা অতিক্রমণের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। রজার্স প্রদত্ত তিন স্তরের প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার। এ স্তরের সমাজ থাকে সনাতন, কৃষি নির্ভর এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীতে আবদ্ধ। এখানে বিশেষ করে পুত্র সন্তানকে উৎপাদনের উপায় এবং লাভজনক বিষয় হিসেবে দেখা হয়। ফলে জন্মহার থাকে অত্যন্ত উঁচু মাত্রায়। আবার অনুন্নত অর্থনীতি এবং চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় মৃত্যুহারও থাকে অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ে। একই হারে জন্ম ও মৃত্যুহারের উঁচু মাত্রার কারণে জনসংখ্যা স্থিতিশীল পর্যায়ে থাকে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-নিম্ন মৃত্যুহার ও উঁচু জন্মহার। এ স্তরে মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পায়। এর কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে অনেক শিশু হত্যাকারী ও ঘাতক রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। কিন্তু জন্মহার সে অনুপাতে কমেনা। প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৬/৭ জন সন্তান থাকে। জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের কারণে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় স্তরে গিয়ে জন্ম এবং মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পায়, মানুষ ক্রমশ উন্নত সমাজ এবং উচ্চতর জীবন মান অর্জন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলে জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ সম্ভবত এদিক থেকে দ্বিতীয় স্তর পার হয়ে শেষ স্তরের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে।

২.২ অন্যদিকে জোফ (Zopf)[৪] প্রদত্ত জনসংখ্যা অতিক্রমণের ৭টি ধাপকে বিবেচনায় নিলে ৯০-এর দশকে এসে বাংলাদেশকে চতুর্থ ধাপ (Incipient Decline) এ ফেলা যায়। এ স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-নীচু জন্মহার ও নীচু মৃত্যুহার। এ স্তরে মৃত্যুহার কমে গিয়ে স্থিতিশীল পর্যায়ে চলে আসে এবং পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করায়, আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নত হওয়ায় জন্মহার কমতে থাকে। জোফ নিজে অবশ্য বাংলাদেশের অবস্থানকে ২য় স্তরে (Incipient Growth) দেখিয়েছেন। এ স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-উঁচু জন্মহার কিন্তু উঁচু মৃত্যুহারের সামান্য হ্রাস। এ ধাপে শিল্পায়ন, নগরায়নের ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যায়। ফলে মৃত্যুহার সামান্য হ্রাস পায়, কিন্তু জন্মহার আগের পর্যায়েই থাকে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সূচনা হয় এ স্তরেই।

২.৩ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সংক্রান্ত তিন যুগের ধারণাটি বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশ সেদিক থেকে সম্ভবত মাঠ যুগ পেরিয়ে সাম্প্রতিক যুগে প্রবেশ করেছে। মাঠ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে; মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'চেইঞ্জ এজেন্ট এইড' (Change Agent Aid) -এর আবির্ভাব, গণমাধ্যম প্রচারণার উপর

গুরুত্ব দেয়া, পোষ্ট পার্টাম এ্যাপ্রোচ প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির প্রসার ঘটানো। এ যুগে চেইঞ্জ এজেন্ট এইডরাই মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে। সাম্প্রতিক যুগে এর সাথে যোগ হয় আরও কিছু স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়-বর্ধন প্রভৃতি সামাজিক কর্মসূচি। এক কথায় এদের বলা হয় পরিবার পরিকল্পনা বহিঃসীমা কর্মসূচি।

২.৪ সামাজিক দিক থেকে বাংলাদেশের সমাজ সনাতন সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এখনও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী স্বাধীন নয়। কারণ সে অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামর্থগত দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই সন্তান নেবে কি নেবে না এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সীমিত। এ সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয় অনেক ক্ষেত্রে তার স্বামী ও শাশুড়ি দ্বারা। তাই সমাজে এখনও বড় পরিবার রীতি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী ব্যবহারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রচারণাও রয়েছে প্রচুর। তবে ডঃ বক-ই-খুদা ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের একটি গবেষণার মত প্রকাশ করেছেন যে, এখন পরিবার পরিকল্পনার প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের মনোভাবে অনুকূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[৫] কিন্তু এ কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। সাধারণ মানুষের মনোভাবেও অনুকূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। এ মনোভাব অবশ্য সকল এলাকায় এবং টার্গেট জনগোষ্ঠীর সকল শ্রেণীর মধ্যে এক নয়। তাঁদের মতে এ মনোভাব আরও অনুকূল করার জন্য বিবাহ বিলম্বিত করা, ছোট পরিবার গঠন ও দুই সন্তান জন্মের মাঝের সময় বৃদ্ধি করা, প্রভৃতি বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য আই, ই, সি, বার্তাগুলোতে অধিক জোর দেয়া দরকার; প্রয়োজনে এদেশের আই. ই. সি. কর্মসূচিকে ঢেলে সাজানো আবশ্যক।

৩.০ পুত্র সন্তানের প্রাধান্য

৩.১ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমে এলেও এখনও সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বহু কারণ রয়ে গেছে যা আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বড় পরিবার ধারণা, পুত্র সন্তানের প্রাধান্য, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি মূল্যবোধগুলো আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনাব এম. এ. মান্নান তাঁর[৬] এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের পিছনে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর রয়েছে। তাঁর মতে শৈশবে মেয়ে শিশুরা পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হলেও (কারণ তারা গৃহস্থালীর কাজ করে) ছেলেরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবারের জন্য অধিক কার্যকর বা উৎপাদনশীল বলে গণ্য হয়। আর মেয়েরা যে কাজ করে তা অস্পষ্ট বা এ কাজ সরাসরি কোন অর্থনৈতিক সুবিধা হিসেবে প্রতীয়মান হয় না। তাঁর মতে বাংলাদেশের সমাজে ছেলে সবসময় তার মা-বাবাকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে, বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবাকে আশ্রয় দেয়। অন্যদিকে একটি মেয়ে তার বিয়ের পর

স্বামীর ঘরে চলে যায়। সে তার বাবা-মা'কে তেমন কোন সাহায্য করতে পারে না। তার বিয়েটাও বিরাট এক খরচের ব্যাপার, বিয়ের অনুষ্ঠানের খরচ ব্যাপক। বাংলাদেশ ও ভারতে মেয়ের বিয়েতে যৌতুক প্রদানের এক বিব্রতকর প্রথার ফলে বাবা-মা'কে পোহাতে হয় এক বিশাল আর্থিক ধকল।

৩.২ বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ হওয়ায় ছেলেরা খুব অল্প বয়স থেকেই কৃষি জমিতে শ্রম দেয়। বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার উপর এক গবেষণায় দেখা যায় একটি ১২ বছরের শিশু যা খায় তার বেশী সে উপার্জন করে।[৭] তা ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন নগরে গার্মেন্টিস ও ধোলাইখাল-জিঞ্জিরা মার্কা ফ্যাক্টরীগুলোতে শিশু শ্রমিকরা কাজ করতে পারে ব্যাপক সংখ্যায়। ফলে বিশেষ করে পুত্র সন্তান এ ক্ষেত্রে একটি লাভজনক বিষয়।

৩.৩ পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় কিছু সমাজে পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের আরও অনেক কারণ রয়েছে। যেমন ঃ পুত্র সন্তানেরা পরিবারের নাম বহন করে, পরিবারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও পারিবারিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা পালন করে। যে সকল দেশে কনফুসিয়াস মতবাদের প্রভাব রয়েছে সেসব দেশে পিতার বড় পুত্রই পারিবারিক সুবিধা-অসুবিধাগুলের নেতৃত্ব দেয়। কোন পরিবারের পুত্র সন্তান না থাকলে ঐ পরিবারটি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই এ সকল সমাজে একজন মহিলার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে একটি ছেলে সন্তানের জন্ম দেয়া। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অনেকাংশে এ কারণগুলো যথার্থ।[৮]

৩.৪ পুত্র সন্তান পছন্দ করার অর্থনৈতিক কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার ধাতৃবিজ্ঞান বিশারদ ইউন-এ ই (Yun-Ae Yi)[৯] বলেন, মায়েরা উপার্জনের দিক থেকে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের কাছ থেকেই টাকা-পয়সা বেশী পায়। তাই গবেষণায় দেখা যায় একজন মায়ের কাছেও মেয়ে সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানের চাহিদাই বেশী।

৪.০ পুত্র সন্তানের প্রাধান্য ও আধুনিক প্রযুক্তি

৪.১ নারী ও পুরুষের যৌন মিলনের মধ্য দিয়ে একটি চমৎকার জৈবিক প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে সন্তানের আগমন ঘটে। গর্ভে অবস্থানের প্রায় তিন চার মাস পর যখন জীবনের অস্তিত্বের উপস্থিতি ঘটে, তখন এসব প্রযুক্তির সাহায্যে মাতৃগর্ভে অবস্থানকারী সন্তানের সঠিকভাবে লিঙ্গ সনাক্তকরণ সম্ভব হয়। বাংলাদেশী সমাজে লিঙ্গ সনাক্তকরণ বিষয়টি একটি প্রচন্ড সামাজিক বিরুদ্ধবাদী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এটা একটি প্রচন্ড 'ট্যাবু' বিষয়ও বটে। যারা বিশেষ করে পুত্র সন্তান কামনা করে, কোন কারণে মাতৃগর্ভে পুত্র সন্তান না থাকলে তখন গর্ভপাতের ব্যাপারটি তাদের সক্রিয় বিবেচনায় চলে আসে। সন্তান ধারণের বেশ কয়েকমাস পরে গর্ভপাত করাতে গেলে মায়ের মৃত্যু ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। কাজেই এই প্রযুক্তির একটি

নেতিবাচক ফলাফল হলো এটা বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ছাড়াও স্বাস্থ্যগত এমন কি বৃহৎ বিবেচনায় নারী প্রজনন স্বাস্থ্য তথা নারী অধিকারকেও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তোলে। শুধু বাংলাদেশে নয়, ১৯৬৭ সালের আগ পর্যন্ত সুইডেন এবং ডেনমার্ক ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গর্ভপাত নিষিদ্ধ ছিল। বৃটেনে এটা আইন সিদ্ধ হয় ১৯৭০ সালে এবং আমেরিকায় ১৯৭৩ সালে। এখনও এর বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া, বৃটেন প্রভৃতি দেশে 'Right to life' আন্দোলন চালু রয়েছে। বাংলাদেশে গর্ভপাতের বিষয়টি একটি নাজুক বিষয় বৈ-কি। তবে এখানে এম. আর. এর নামে গর্ভপাত ঘটানো হয়ে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এখন বাংলাদেশেও মাতৃগর্ভে সন্তানের অবস্থান ও লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য এই প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। লিঙ্গ নির্ধারণের বিষয়টি বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় স্বাস্থ্য, প্রজনন, ফার্টিলিটি ছাড়াও এ দেশের সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধকেও বহুলাংশে প্রভাবিত করছে, চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে।

৪.২ সম্প্রতি এশিয়ার দেশগুলোতে পুত্র সন্তানের প্রাধান্য সম্পর্কে বিভিন্ন ফোরামে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে। ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় এশিয়ার দ্রুত পরিবর্তনশীল জনসংখ্যার নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে মাতৃগর্ভে অবস্থানকারী জন্ম-পূর্ব শিশুর লিঙ্গের প্রাধান্য সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম (International symposium on sex' preference for children in the rapidly changing demogarphic dynamics in Asia) । এতে পুত্র সন্তানের প্রাধান্য, গর্ভপাত ও নীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

৪.৩ এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই মেয়ে সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানের জন্ম হচ্ছে বেশী। ফলে লিঙ্গ অনুপাত হচ্ছে ১০০ জন মেয়ের জন্য ১০৪-১০৭ জন ছেলে। তবে এখনও ছেলে শিশুর মৃত্যুর হার মেয়ে শিশুদের তুলনায় বেশী হওয়ায় ধীরে ধীরে একটি ভারসাম্য অবস্থায় চলে আসে।[১০] বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে মেয়ে শিশুর মৃত্যুর হার ছিল ৮৬ ও ছেলে শিশুর মৃত্যুর হার ৯০[১১]।

৪.৪ যে সকল সমাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুত্র সন্তান চাওয়া হয় বা পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দেয় হয়, সে সকল সমাজে শিশুদের লিঙ্গ অসাম্য বাড়তে পারে। কারণ অবহেলা বা অব্যবস্থার ফলে মেয়ে শিশুদের মৃত্যুহারও বেড়ে যেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন পরিবারে মেয়ে শিশুকে হত্যাও করা হয়। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভারতের বিহার রাজ্যে। সেখানে দাইরা মাত্র ৫০ রুপির বিনিময়ে নবজাত মেয়ে শিশুকে হত্যা পর্যন্ত করে থাকে।[১২] মাতৃগর্ভে থাকাকালে শিশুর লিঙ্গ সনাক্তকরণ প্রযুক্তি ও তার ব্যবহার নির্বাচিত উপায়ে; বিশেষ করে মেয়ে শিশু গর্ভে থাকলে, তার abortion বা ভ্রূণ হত্যার হারকে যথেষ্ট মাত্রায় বাড়িয়ে তুলছে। এ সম্পর্কে সম্প্রতি Asia-Pacific Population and Policy- তে মন্তব্য করা হয়েছে

যে, In several Asian countries the introduction to technologies to determine the sex of unborn fetused combined with the widespread availability of abortion has led to a record preponderance of male births, suggesting that couples are selectively aborting females" [১৩]

৪.৫ সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও তাইওয়ানে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সন্তানের লিঙ্গ জেনে যাওয়ার প্রযুক্তির প্রচলন শুরু হয়েছে। ভ্রুণ অবস্থায় শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ প্রযুক্তি ১৯৮০-এর দশকে এশিয়ার অনেক দেশে চলে আসে। বর্তমানে লিঙ্গ সনাক্তকরণের ব্যাপারে তিন ধরনের প্রযুক্তি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে; কোরিওনিক ভিলি স্যাম্পলিং (Chorionic Vilii Sampling), অ্যামনিও সেন্তেসিস (Amniocentesis) ও আল্ট্রাসাউন্ড (Altrasound)। এর মধ্যে আল্ট্রাসাউন্ড সবচেয়ে নিরাপদ প্রযুক্তি একক। এতে ব্যয় কম ও এটি বহুল ব্যবহৃত প্রযুক্তি। আল্ট্রাসাউন্ডের যন্ত্রপাতি প্রথম ব্যাপকভাবে তৈরী হয় ১৯৮০ এর দশকে দক্ষিণ কোরিয়ায়। চীন এ যন্ত্রপাতি তৈরী করতে শুরু করে ১৯৭৯ সালে। ভারতেও প্রায় ১০০ হাসপাতালে আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহৃত হয়। এ প্রযুক্তির উদ্ভব হয়েছিলো শিশুর কোন শারীরিক সমস্যা আছে কিনা তা দেখার জন্য।

৫.০ পুত্র সন্তানের প্রাধান্য ও ফার্টিলিটি

৫.১ পুত্র সন্তানের প্রাধান্য ও ফার্টিলিটির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে পরস্পর ভিন্নধর্মী বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রথম দিককার পর্যবেক্ষকরা পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন যে, পুত্র সন্তানের প্রাধান্য জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবে। কারণ দম্পতিরা তাদের ছেলে সন্তানের সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না পাওয়া পর্যন্ত সন্তান নিতে থাকবে। কয়েকটি গবেষণায় পুত্র সন্তানের প্রাধান্য ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন-১৯৯১ সালে তাইওয়ানে একটি জরিপে দেখা যায়, যে সকল দম্পতির দু'টি সন্তানের অন্তত একটি ছেলে, তাদের শতকরা ৯০জন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করে। অন্যদিকে যাদের দু'টি সন্তানই মেয়ে তাদের শতকরা ৭৬ জন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করে।[১৪]

৫.২ বাংলাদেশেও পুত্র সন্তানের প্রাধান্য জন্মনিরোধ সামগ্রীর ব্যবহারকে প্রভাবিত করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকেও প্রভাবিত করেছে। এ আই. চৌধুরী ও তার সহকর্মীদের গবেষণায় দেখা যায়, যে সকল পরিবারে পুত্র সন্তানের সংখ্যা বেশী সে সকল পরিবারের মহিলারা আর সন্তান চায় না।[১৫] এম. রহমান[১৬] তাঁর গবেষণায় বলেছেন পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে ফার্টিলিটি কমানোর ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে। আর. আমিন ও এ. জি. মরিয়মের[১৭] লেখায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের উপরও পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ও

জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের উপর পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের একটি প্রতিকুল প্রভাব রয়েছে। আর ফার্টিলিটি নিয়ন্ত্রণের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব অনেক বছর ধরে বিদ্যমান।

৫.৩ অন্যদিকে আর. বৈরাগী[১৮] অবশ্য মতলবের দু'টি এলাকার উপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের শক্তিশালী ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও ফার্টিলিটির উপর এর প্রভাব খুব বেশী নয়। তবে এশিয়ার অনেক দেশেই; যেমন-তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনে পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের কারণে ফার্টিলিটির হার অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল।

৬.০ লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাত

৬.১ লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাত করার ফলে এশিয়ার দেশগুলোতে জন্মের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০-এর দশকে চীন, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় অস্বাভাবিকভাবে তা বাড়তে শুরু করে। ১৯৯২ সালের ডাটা অনুসারে চীনে ১০০ জন মেয়ে প্রতি ছেলে হচ্ছে ১৮৯জন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১১৪, তাইওয়ানে ১১০ ও ভারতে ১১২জন।[১৯]

৬.২ ১৯৮০-এর দশকে এসে দেখা যায় দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনে যখনই লিঙ্গ অনুপাতের মধ্যকার ব্যবধান কমতে থাকে, তখনই লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতের কারণে তৃতীয় ও পরবর্তী সন্তানের জন্মের ক্ষেত্রে ব্যবধান বাড়াতে থাকে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৮৯ সালে চতুর্থ সন্তানের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অনুপাত ২০৯-এর অর্থ হচ্ছে এ জন্ম ধারায় একটি মেয়ে সন্তানের বিপরীতে দু'এর অধিক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। ১৯৯০ সালের দিকে তাইওয়ানে তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অনুপাত ১৩৪ ও চতুর্থ সন্তানের ক্ষেত্রে ১৫৯-এ দাঁড়ায়।[২০]

৬.৩ এ লিঙ্গ অনুপাত বৃদ্ধি লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এখনও সমগ্র বিশ্বের লিঙ্গ অনুপাতের উপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়েনি। তবে যে সকল দেশে ফার্টিলিটি কম, সে সকল দেশে প্রথম দিককার জন্ম সংখ্যায় লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতের কারণে দেশের জনসংখ্যার নারী-পুরুষের সংখ্যার ব্যাপক তারতম্য ঘটতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৯০ সালের মধ্যে মেয়ে সন্তান জন্মাতে এমন ৮০ হাজার গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে। ঐ সময়কালে জন্ম নেয়া মোট মেয়ের সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ।[২১]

৬.৪ তবে লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতের ফলে সৃষ্ট লিঙ্গ অসাম্য সাময়িক হতে পারে। কেননা দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্প্রতিক তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রথম শিশুর ক্ষেত্রে লিঙ্গ অনুপাত বাড়লেও দ্বিতীয় শিশুর জন্মের ফলে এ অনুপাত কমে যায়। ১৯৯১ সালে এক জরিপে দেখা যায়, সমাপ্ত ফার্টিলিটির ক্ষেত্রে প্রথম সন্তানের জন্য লিঙ্গ অনুপাত ১১৮, দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হওয়ার কারণে দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে ১০৪

এবং দ্বিতীয় সন্তান ছেলে হওয়ার কারণে দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে অনুপাত ৯৪। কিন্তু ১৯৯৩ সালে এসে দেখা যায় দক্ষিণ কোরিয়ায় এ অনুপাত ১১৫.৬ জন ছেলে প্রতি মেয়ে ১০০জন। এ ব্যবধান বাড়ার কারণ হচ্ছে ব্যাপক হারে লিঙ্গ নির্ধারণ পূর্বক গর্ভপাত।[২২] এশিয়ার অনেক দেশের মত দক্ষিণ কোরিয়ানরা প্রথমে পুত্র সন্তান ও পরে মেয়ে সন্তান গ্রহণ করতে চায় এবং দম্পতিরা লিঙ্গ নির্ধারণ-পূর্বক গর্ভপাতের মাধ্যমে তাদের পরিবারের বিন্যাস ঠিক করে।

৬.৫ চীনের ক্ষেত্রেও এ লিঙ্গ অনুপাত ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। স্বল্পোন্নত পল্লী অঞ্চলে লিঙ্গ অনুপাত কম, উন্নত অঞ্চলগুলোতে বেশী এবং তুলনামূলকভাবে মডারেট সিটিগুলো; যেমন-সাংহাই ও বেইজিং-এ কম। এ বড় শহরগুলোর প্রবণতা ভবিষ্যতে গোটা চীনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।[২৩]

৬.৬ বাংলাদেশে গর্ভপাত সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। তবে এম. আর. করার অনুমতি রয়েছে। ফলে এম. আর. এর নামে এ দেশেও নির্বিবাদে গর্ভপাত করানো হচ্ছে। এ গর্ভপাতের পরিমাণ সংক্রান্ত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়না। এ গর্ভপাতের মধ্যে লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতও একটি বড় বিষয়।

৭.০ নীতি ও সুপারিশ

৭.১ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ লিঙ্গ নির্ধারণ প্রযুক্তির ভবিষ্যত প্রভাব নিয়ে চিন্তিত এবং বিষয়টি এখন বিভিন্ন ফোরামে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। কোন কোন দেশ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৮৭ সালে লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য 'ভ্রূণ নিরীক্ষা প্রযুক্তি'র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার স্বাস্থ্য ও সমাজ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ পরীক্ষায় জড়িত ডাক্তারদের জরিমানা বৃদ্ধি করে এবং এ জন্য ৮জন ডাক্তারের মেডিক্যাল লাইসেন্স বাতিল করা হয়। ১৯৯৪ সালে মেডিক্যাল কোড আরও শক্তিশালী করা হয়। যে সকল ডাক্তার এ পরীক্ষা করবে তাদের এক বছর সাজা, ১২০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত জরিমানা এবং তাদের মেডিক্যাল লাইসেন্স বাতিল করার বিধান রাখা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের তথ্যানুসারে দেখা যায় এ জরিমানা বৃদ্ধি করে তা ১৩০০০ মার্কিন ডলার ও কারাদন্ডের ব্যপ্তি দুই বছরের স্থলে তিন বছরে বৃদ্ধি করা হয়েছে।[২৪]

৭.২ ১৯৮৯ সালের মে মাসে চীনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি নোটিশের মাধ্যমে জন্মপূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে। চীনে পুত্র সন্তানের প্রাধান্য দূর করার জন্য বাবার পরিবর্তে মায়ের নামে পরিবারের নামকরণ প্রথা চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে।

৭.৩ ১৯৮৩ সালে ভারতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে এ লিঙ্গ নিরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয় এবং সম্প্রতি ভারতীয় সংসদ এই বলে একটি বিল পাশ করেছে যে, জেনেটিক সমস্যা নির্ধারণ করার জন্যই কেবল এ প্রযুক্তির ব্যবহার করা যাবে।

যদিও এ জন্য আইনগত কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ তবে কিছু পর্যবেক্ষক বিশ্বাস করেন যে, লিঙ্গ নির্ধারণ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিকে বরং বিক্ষিপ্ত ও ব্যয়বহুল করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন[২৫] ১৯৯৩ থেকে দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আনাড়ী গর্ভপাতের কারণে প্রতি বছর কমপক্ষে ৬০ হাজার মহিলা মারা যায়। এ সকল দেশে গর্ভপাত অবৈধ হওয়ায় এ মহিলাদের অনেকেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারেনা।

৭.৪ সিউল সিম্পোজিয়ামে লিঙ্গ নির্ধারণপূর্বক গর্ভপাতের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা সরকারি পর্যায়ে কিছু পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ও সুপারিশ পেশ করেছেন, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ও যথার্থ। সুপরিশগুলো হচ্ছেঃ

- লিঙ্গভেদে বৈষম্য দূর করার জন্য নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। যেমন- বৈষম্যমূলক আইন, বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার প্রথা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা, পার্থক্যমূলক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক প্রবেশাধিকার, প্রভৃতি বাতিল করা।
- জন্ম পূর্ববর্তী পরীক্ষা যাতে লিঙ্গ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে না করা হয় তা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের নীতিমালা তৈরীর জন্য নীতিমালা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ডায়ালগের উদ্যোগ নেয়া।
- লিঙ্গ সংক্রান্ত সমতা আনার জন্য গণমাধ্যম, ফোক মিডিয়া, আন্তঃব্যক্তিক মাধ্যম, স্কুল কারিকুলামসহ তথ্য প্রবাহের সব ধরনের চ্যানেল ব্যবহার করা।
- ছেলে সন্তানের প্রাধান্য ও জন্মপূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে মেডিকেল কলেজগুলোর কারিকুলামের নীতিমালা শক্তিশালী করা।
- পরিসংখ্যান সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও তথ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষমতা বাড়ানো।
- সর্বোপরি, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সংশ্লিষ্ট পেশা ও সেবার সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের নৈতিক অবস্থান দৃঢ় করা ও এতদসংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণ।

তথ্যসূত্রঃ

১. শিকদার, সামাদ *''নারীর মর্যাদা ও প্রজনন স্বাস্থ্য আনে উন্নয়ন''*-প্রজন্ম পরিবার পরিকল্পন সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা। বর্ষ ১৪, সংখ্যা ১০। ১৯৯৫ পৃষ্ঠা৬-১২।

2. Khua. Barkat-e et al. *Literature review for the development of the National FP-MCH IEC Strategy in Bangladesh.* University Research Corporation (Bangladesh), Dhaka. 1992. PP I-VI.

3. Rogers. E. M. *Communication Strategies for Family Planning* The Free Press. New York. 1973 P2-3.
4. Zopf (Jr) Paul E. *Population An Introduction to Social mayfield* publishing Company (Firit Edition). 1984. PP57-66.
5. Khud. Barkat-e Et. al op cit.
6. mannan. M. A. *"Seyval Division of Labour and Son preference in Rural Bagnladesh in Demography India.* Hindustan publishing Corpn (India) Vol. 17 (2) 1988. pp. 242-272.
7. Westly. Sidney B. *"Evidence mounts for Sex Selective Abortion in Asia"* in Asia-Palific population & policy. East West centre. Honolulu. No. 34. 1995. pp. 1-4.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. *Human Development Report.* UNDp. Dhaka. Bangladesh 1992.
১২. মনীরুজ্জামান। *"বিহারের ট্রাজেডি মেয়ে সন্তান হত্যাঃ" যায় যায় দিন বর্ষ* ১১, সংখ্যা ২১। ১৯৯৫ পৃঃ ১২-১৩।
13. Westly. Sidney B. op. cit.
14. Ibid.
15. Chowdhury A. I et. al. *"Effects of Family Sex Composition on Fertility preference and Behaviour in Rural Bangladesh"* in Journal of Biosocial Science. The Bissouial Socity. England. Vol 25 (4) 1993 pp. 455-462.
16. Rahman. M. Gendeer Preference. *Fertility Behaviour and Excess Female Child mortality in Matlab,* Bangladesh. Doctoral Dissertation. John Hopkins University. U. S. A. 1991
17. Amin. R. et. al. *"Son preference an Bangladesh An Emerging Barrier to Fertility Regulation"* inJournal of Biosocial Science. The Biosocial Society. England. Vol 19 (2) 1987. PP 221-28.
18. Bairagi. R. *"Is gender Preference an obstacle to the success fo Family planning Programms in Rural Bangladesh"* Presecr in international population conference. Mortreal. Aug. 24-Sept. 01. 1993. Compilw by international Union for the Scientific Study on popalation. Liege. Belgium. Vol. I. pp. 121-34.
19. Westly. Sidney B. op. cit.
20. Ibid.
21. Ibid.
21. Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. *Population Headliners* population Divdision. ESCAP. Bankik August. 1995. P.4
25. ***World Development Repost*** world Bank. 1993.